The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 1, pp 25-38, ISSN 2306-3920

সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

আরিফা সুলতানা*

[**সার-সংক্ষেপ:** ন্যায়বিচারের ধারণাটি আইন, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। তবে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাটি সমাজবদ্ধ মানুষের একটি সমাজনৈতিক চেতনা বা দায়িত্ববোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মূলত দেখা হয়ে থাকে। যুক্তি-বুদ্ধি ও নৈতিক দায় সমৃদ্ধ মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সামাজিক ন্যায়বিচারকে কাম্য বা প্রয়োজনীয় মনে করলেও অনেক সময় মানুষ এমন কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে যা সামাজিক ন্যায়বিচার, এমনকি, সংহতিকে বিনষ্ট করে। বিভিন্ন নীতিদার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম যুগেযুগে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বর্তমান সময়ে ধর্মীয় নীতিবিদ্যা নামে জ্ঞানের যে শাখাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তারও একটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার। ইসলাম ধর্মভিত্তিক নৈতিক আলোচনা বা ইসলামী নীতিবিদ্যা এ বিষয়টিকে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাপক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত প্রায়োগিকভাবে একটি সার্থক মতবাদ বা নীতিমালা প্রবর্তন করা যায় বলে মনে হয়। বর্তমান গবেষণায় ইসলামী নৈতিকতার আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি প্রায়োগিক নীতিমালা প্রবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করা হবে। এই আলোচনায় বিশ্লেষণধর্মী ও মূল্যায়নধর্মী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।]

ভূমিকা:

সেমেটিক ধারার প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলামকে সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইসলাম ধর্ম হিসেবে মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে প্রচারিত হয়। মানুষকে মানবকল্যাণ ও সৎকর্মে উদ্যোগী হওয়ার জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা। ইসলাম মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর এ দুয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জীবনকে কল্যাণময় করা। বাস্তবিকভাবে মানবজীবনের তথা মানুষের সামগ্রিক জীবনের এমন কোনো বিষয় পাওয়া যায় না যে বিষয় ইসলামের দিক-নির্দেশনা নেই। কোনো বিষয়ে দৃশ্যত সুনির্দিষ্ট কোনো সমাধান না থাকলেও সে ক্ষেত্রেও এমন কিছু না কিছু নীতিমালা পাওয়া যাবে যার ভিত্তিতে মানবজীবন সংক্রান্ত ঐসব ঘটনার সমাধান করা সম্ভব। সমাজজীবনের ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজে বসবাসকারী মানুষের নানাবিধ সম্পর্কের মধ্যেকার দায়-দায়িত্বের প্রসঙ্গটি মুখ্য হয়ে ওঠে। মানবজাতির ইতিহাসে কিছু সম্পর্ক প্রায় সব সমাজেই বিদ্যমান ছিল। তার ভিত্তিতে এ পর্যায়ে

---

* **আরিফা সুলতানা :** অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

কিছু উল্লেখযোগ্য সামাজিক সম্পর্ক তুলে ধরে তাদের মধ্যে কীভাবে ন্যায়ানুগ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। বর্তমান গবেষণায় সামাজিক ন্যায়বিচারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনাগুলোর পর্যালোচনা করা হবে।

ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইসলামের সাধারণ ধারণাঃ

ন্যায়বিচার হলো নৈতিকতা, যুক্তিযুক্ততা, আইন, প্রাকৃতিক আইন, ধর্ম, ন্যায়পরায়ণতা এবং ন্যায্যতার ওপর ভিত্তি করে নৈতিক অধিকারের একটি ধারণা। (Manan, 2005: 48) ইসলামে ন্যায়বিচার বলতে কোন কিছুকে তার যথার্থ বা ন্যায্য জায়গায় স্থাপন করাকে বোঝায়। এটি কোন বৈষম্য ছাড়াই অন্যদের প্রতি সমান আচরণ করাকে বোঝায়। সাধারণত ন্যায়বিচার আরবি শব্দ আদল বা এর প্রতিশব্দের অনুবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরবিতে 'আদল' এর আভিধানিক অর্থ হলো নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণ যা ন্যায্যতা, ভারসাম্য, সংযম এবং সরলতা বোঝায়। (Majid, 1984: 6-8) জ্ঞানতাত্ত্বিভাবে 'আদল' মানে জীবন সহ সমস্ত জিনিসের প্রতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি। (Mahmoud, 1996:19) আরবি ভাষায় ন্যায়বিচার হলো আল- আদালাহ বা আল-আদল যা একটি জিনিসকে অন্য ধরনের জিনিসের সমান হিসেবে বোঝায় যাতে পূর্বেরটিকে পরবর্তীটির মতো করা যায়। আল-আদালাহকে ভাল, ধার্মিক বা সত্যের সেই গুণের অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ন্যায়ের অর্থ আল্লাহ এবং মানবতার ক্রিয়াকলাপে 'ভারসাম্য' এবং 'পরিমাপ' ধারণার সাথে যুক্ত। (Massimo, 2006:13) আদল বা ন্যায়বিচারের অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে এবং তার মধ্যে একটি হলো কিস্‌ত যার অর্থ অন্যের সাথে ন্যায্য আচরণ করা। (Mahmoud, 1996:19) সামাজিক ন্যায়বিচার মানে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অংশ দেওয়া। বিস্তৃত অর্থে সামাজিক ন্যায়বিচার হলো প্রথমত আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়ত, সমাজের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সামাজিক ন্যায়বিচার মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে নিষেধ করেন না যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করেও দেয় না, তাদের সাথে উত্তম আচরণ ও ন্যায়বিচার করতে, কারণ আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।" (সু:৬০, আ: ৮)

ইসলাম সমাজের সদস্যদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্যভাবে সম্পর্ক সংগঠিত করার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্য হলো সমাজের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা এবং কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম ন্যায়বিচারের ওপর অনেক জোর দেয় কারণ এটি সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে যা মানুষকে তাদের মানবিক গুণাবলি বিকাশ করতে, শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম করে। সম্প্রীতি ও ভালোবাসায় এই বিশ্বকে বেঁচে থাকার যোগ্য করে তোলে। শান্তিময় জীবন তখনই সম্ভব হবে যখন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্যতা থাকবে। ইসলামে ন্যায়বিচার শুধুমাত্র অনুশীলনকারী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমাজের সকল সদস্যদের অধিকার। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ কুরআনে বলেন, "নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করেছি রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তাঁদের সাথে আমি অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদন্ড (ইনসাফ), যাতে মানুষ ন্যায়বিচার কায়েম করতে পারে।" (সু: ৫৭, আ: ২৫) এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, নবীগণকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার, বিশ্বাসের পক্ষে মানুষকে একত্রিত করার জন্য এবং সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিশ্বকে ন্যায়বিচারে শাসন করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ন্যায়বিচারের সারমর্ম হলো স্বীকৃতি যে, সমস্ত মানুষ সমান এবং এর অর্থ হলো সমাজের সকলের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরি করা।

মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ন্যায়বিচারঃ

মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ন্যায়বিচার হল আল্লাহর ইচ্ছা ও সারাংশ সম্পর্কিত ধর্মতত্ত্ববিদদের দ্বারা নির্ধারিত মতবাদ অনুসারে ন্যায়বিচার। ধর্মতাত্ত্বিক ন্যায়বিচারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান স্কুল রয়েছে যা হল মুতাজিলা মতবাদ এবং আশারিয়া মতবাদ। (Khalid, 2024,15 January) মুতাজিলারা বলেন, মানুষ তার ন্যায় ও অন্যায় উভয় কাজের জন্য দায়ী, যার জন্য তাকে পরকালে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে। তারা মনে করেন, ন্যায়বিচার ঐশ্বরিক এবং আল্লাহ তার ঋণী। ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার পৃথিবীতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুতাজিলারা বলেন, একটি মহান আল্লাহ দ্বারা নির্ধারিত এবং অপরটি যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত। তবে সমস্ত ধর্মতত্ত্ববিদ একমত ছিলেন যে, আল্লাহর ন্যায়বিচার নিখুঁত, চিরন্তন এবং আদর্শ। (Sharif, 1961: 200-201) আশারিয়াদের মতে, ন্যায়বিচার মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অধীন নয় কারণ আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং সেখানে মানুষের বা যৌক্তিক বিচারের কোন অবকাশ নেই। তাদের মতে, ন্যায়বিচার হলো আল্লাহর ইচ্ছার একটি অভিব্যক্তি এবং মানুষকে তা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে যা হওয়ার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে কারণ আল্লাহ জানেন সামগ্রিকভাবে মানুষের জন্য কী ভালো। (Sharif, 1961: 231)

ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচারঃ

পবিত্র কুরআন সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, যা ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখা ও মন্দকে দূর করা। ইসলাম আল্লাহর ইচ্ছা ও আইনের কাছে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শান্তি অর্জনের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। পবিত্র কুরআনে ন্যায় বিচারের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে এভাবে, নিশ্চয়ই, "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচারণ করার নির্দেশ দেয়।" (সু: ১৬, আ: ৯০) যা সব অবস্থায় ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। ইসলাম ন্যায়বিচারের নীতিকে গুরুত্ব সহকারে মূল্য দেয় কারণ ন্যায়বিচার ছাড়া মানবজীবনে কোন অবিচ্ছিন্ন বা স্থিতিশীল ব্যবস্থা থাকতে পারে না। ইসলাম মনে করে ন্যায়বিচার মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে, একে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী করে তুলবে এবং যারা সঠিক পথ থেকে বিপথগামী হয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনবে। (Qutb, 1953: 21) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা পরস্পরকে নেক কাজ ও পরহেজগারীতে সাহায্য কর, কিন্তু পাপ কাজে ও সীমাতিক্রমে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সু: ৫, আ: ২) আল্লাহ আরো বলেন, ''তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেইঃ এটা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং যারা জ্ঞানের অধিকারী, ন্যায়ের উপর অটল তারা সাক্ষী। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।" (সু: ৫, আ: ১৮) এই আয়াতে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি একটি ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এমন একটি বিশ্ব যার কোন ত্রুটি নেই, যেখানে সবকিছু তাঁর আদেশে কাজ করে এবং মানবজাতির জন্য কিছু বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছেন যাতে সমাজে শান্তি ও প্রশান্তি বিরাজ করে এবং অন্যান্য সৃষ্টি ও মানবতার মধ্যে সর্বাধিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারে। (Mahmoud, 1996: 22-23)

ইসলাম ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে কুরআনের আদেশ গ্রহণ করার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। ইসলামে ন্যায় বিচার সংজ্ঞার দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। (Manan, 2005: 48) (১) এটি বোঝায়, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে দু'জন মানুষ সমান। তাদের সাথে একই আচরণ করা উচিত। ইসলাম "সমান সমান আচরণ কর" নীতিকে সমর্থন করে। (২) এটি আরেকটি মৌলিক নীতি দ্বারা সমর্থিত হয়'' প্রত্যেকের প্রাপ্যকে দেওয়া।" ইসলাম অর্থ হলো শান্তি। আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করা। এই আত্মসমর্পণ আল্লাহর পথে থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে হতে পারে। কুরআন ন্যায় বিচারকে অনেক গুরুত্ব দেয়। কারণ শান্তি ও ন্যায়বিচার এই দুটি বিষয় শুধু পারস্পরিক সম্পর্কই নয়,

বরং একে অপরের পরিপূরক। আল কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে ন্যায়বিচার। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার মুসলমানদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান করেছেন। মহানবী(সা:) তাঁর সারা জীবন ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলাম বিশ্বের কাছে এই ধারণাটি উপস্থাপন করে যে, বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও, সমস্ত মানুষ সমান। সকলেই সমান সামাজিক মর্যাদা ও সমান অধিকারের অধিকারী। কেউ নিকৃষ্ট বা উচ্চতর নয়। এস. কুতুব মনে করেন, ইসলামে ন্যায়বিচার তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১. বিবেকের পরম স্বাধীনতা, ২. মানুষের সম্পূর্ণ সমতা, ৩. সমাজের স্থায়ী পারস্পরিক দায়িত্ব। (Qutb, 1956: 30) তিনি মনে করেন, ন্যায়বিচার আত্মার অভ্যন্তরীণ প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত হয়। এবং এটি মানবজাতির সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য পূরণ করবে। এই ধরণের সম্পূর্ণ স্বাধীণতা ছাড়া মানব প্রকৃতি অপমান, বশ্যতা এবং দাসত্বের শক্তির বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারে না। এই স্বাধীনতা তাই সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে কাজ করে, হোক না এটি আধ্যাত্মিক বা সামাজিক। যাতে সমাজে সমতার ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ইসলাম একটি ধর্ম যা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামের বিশ্বদর্শনের অন্তর্নিহিত নীতিগুলোর একটি হলো ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার ধর্মের আসল লক্ষ্য। মহাবিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার বজায় রাখা এবং নিষ্ঠুরতা ও মন্দকে দূর করা। তাই ইসলামী ন্যায়বিচার ব্যাপক ও সীমাহীন। এটি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানবজীবনের সমস্ত দিককে অন্তর্ভূক্ত করে। ইসলামে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রকে আইনগত ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের দুটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যেতে পারে। (Asma, 2020: 273) সামাজিক ন্যায়বিচারকে তিনটি ভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা- সম্পর্কীয়, বন্টনমূলক এবং প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচার। (Juliyana, Latifah, Arif, 2022: 2409) সম্পর্কীয় ন্যায়বিচার মানব সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত যেমন- পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী বা সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক, বন্টনমূলক ন্যায়বিচার সম্পদ এবং সুযোগের ন্যায্য বন্টনের সাথে জড়িত। প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচার অপরাধের সাথে জড়িত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত। বর্তমান গবেষণায় আমাদের আলোচনার বিষয় সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কিত। সামাজিক ন্যায়বিচার মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিচে সামাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হলো :

মানুষ হিসেবে সকলের মধ্যে ন্যায়বিচারঃ

ইসলাম মানুষের মধ্যে ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণতা ইসলামি চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। ন্যায়পরায়ণতার গুণ ছাড়া কোন মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ন্যায়পরায়ণতার গুণে গুণান্বিত করতে হবে নিজেকে। মানুষকে সর্বপ্রথম সুবিচার করতে হবে তার ব্যক্তিজীবনে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেন। (সু:১৬, আঃ ৯০) আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির চেয়ে সম্মানিত করে তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছেন। আল্লাহ বিশেষভাবে মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, এবং অবশ্যই আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বহন করেছি এবং তাদের জন্য উত্তম জিনিস দিয়েছি এবং আমি যা সৃষ্টি করেছি তার অনেকের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি। (সু: ১৭, আঃ ৭০) এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে বিশ্বজগতের স্রষ্ঠা সব মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমাদেরকেও সকলকে সমান ভাবতে হবে এবং সবার সাথে মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

ইসলাম মানবিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য ভালো আচরণকে উৎসাহিত করে। এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখার ওপর জোর দেয়। কুরআন বিশেষভাবে লোকদেরকে সতর্ক করে যে, অন্যদেরকে উপহাস করবে না, মানহানি করবে না, একে অপরের প্রতি ব্যঙ্গ করবে না, একে অপরকে আপত্তিকর নামে ডাকবে না কারণ অন্যরা আল্লাহর দৃষ্টিতে ভালো হতে পারে। (সু: ৪৯, আ: ১১১, ১১২) অদৃশ্য কলাণের কারণে। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে অন্যের কল্যাণ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এবং ন্যায়বিচার একে অপরের সাথে এতটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, ইসলাম পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি আদর্শ সমাজ ''মদিনান সমাজ'' এর ভিত্তি স্থাপন করেছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে ছিল প্রথম। এবং সেই ঘটনাটি 'মুওয়াখা'' (ভ্রাতৃত্ব) নামে পরিচিত। তাই মানুষের উচিত নয় অন্যের খারাপ কাজ এবং দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করা কারণ 'সুন্দর কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন দানের চেয়ে উত্তম' । (সু: ২, আ: ২৬৩) মহানবী (সা:) বলেছেন,''যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়াশীল নয়, তার প্রতি দয়া করা হবে না। (বুখারী, ৬০১৩) মানুষের উচিত বিশ্বে ন্যায়বিচার বাস্তবায়নকারী হওয়ার চেষ্টা করার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার প্রশংসা করা।

দাম্পত্যজীবনে ন্যায়পরায়ণতা:

বিবাহ নারী-পুরুষের মধ্যে যেমন পরিবার সৃষ্টিতে অবদান রাখে, তেমনি দাম্পত্যজীবনে পরস্পরের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা অনুরাগ সৃষ্টি করে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন ও শান্তি সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক। স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন মাধুর্যময় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য ইসলাম উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কিছু অধিকার এবং কর্তব্য, তা যেমন স্বামীর জন্য অবশ্য পালনীয় তেমনি স্ত্রী পক্ষেও। কুরআনে বলা হয়েছে, ''স্ত্রীদের উপর পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষের উপর ন্যায়সঙ্গত।'' (সু: ২, আ: ২২৮) আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, ''তারা(স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। (সু: ২, আ: ১৮৭) পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহে স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের জন্যে 'যাওজ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে এটা বোঝাবার জন্য যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অন্তরের গভীর একাত্মপূর্ণ ভাবধারা ও ভেদহীন কল্যাণ কামনার সাহায্যে একাকার হয়ে থাকবে, তা-ই হচ্ছে স্বাভাবিকতার ঐকান্তিক দাবি। তারা একাকার হবে এমনভাবে যে, একজন ঠিক অপরজনে পরিণত হবে। আল্লাহ স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেনঃ "তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভালভাবে ব্যবহার ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছো, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ রাখবেন।"(সু: ৪, আ: ১৯) মহানবী (সা:) বলেছেন, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিস্কলুষ সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভাল। (বুখারী, ৩৫৫৯) হাদীসের আলোকে দাম্পত্যজীবন সুখী ও মধুময় করে তোলা এবং একজন দায়িত্বশীল ও সফল স্বামী-স্ত্রী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার উপায় হলঃ ১.একে অপরের প্রতি প্রেম ভালোবাসা থাকা, ২.উভয়ের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা থাকা। ৩.পরস্পর ক্ষমা প্রদর্শন করা। ৪. একে অন্যের সাথে ভালো আচরণ করা। ৫.একে অপরের প্রশংসা করা, ৬. নিজেদের দোষ গোপন রাখা, ৭. গোপনীয়তা রক্ষা করা, ৮. নিজেদের পরিপাটি রাখা, ৯.ঘরের কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করা। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর গভীর একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়া যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করা আবশ্যক।

পিতামাতা ও সন্তানের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা:

পৃথিবীতে পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। পিতা-মাতা আমাদের জন্য আল্লাহর সেরা দান। তাঁরা সর্বদা সন্তানের কল্যাণ কামনা করে। ইসলাম এরূপ মমতাময়ী ও কল্যাণকামী পিতা-মাতার প্রতি

সন্তানের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করেছেন। পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ পালন সন্তানের জন্য ওয়াজিব (কর্তব্য)। সেই সাথে পিতা-মাতার সেবা যত্ন করা সন্তানের কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (সু: ১৭ , আ: ২৩) পিতা-মাতা বৃদ্ধ হলে সন্তান তাদের অধিকতর সেবাযত্ন করবে। তাদেরকে ধমক দেবে না বা মনে কষ্ট পায় এরূপ কোন কথা বা কাজ করবে না। তাঁদের সাথে উত্তম ও সম্মানজনক ভাষায় কথা বলবে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ''যদি পিতা-মাতার একজন অথবা উভয়ে তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি তুমি বিরক্তিসূচক শব্দ 'উহ্' উচ্চারণ করো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না। তাঁদেও সাথে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলো। (সু: ১৭, আ: ২৩) তাদের উদ্দেশ্যে সর্বদা আল্লাহর নিকট আমাদের এই দোয়া করা উচিত ''হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার পিতা-মাতার প্রতি তেমনি সদয় হওঃ যেমনিভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে (আদরযত্নে) লালনপালন করেছেন।" (সু: ১৭, আ: ২৪) পিতা-মাতার ভরণপোষনে দায়িত্ব পালন করা সন্তানের ওপর কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ''বলুন, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমার পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে। (সু: ২, আ: ২১৫) পিতা-মাতা আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এই নিয়ামতের দেখভালো করা আমাদের কর্তব্য। স্নেহময়ী সন্তানের প্রতিও পিতা-মাতার কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে। সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা-মাতার প্রতি তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কতক হক কার্যকর হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই সে হক অনুযায়ী আমল করা পিতা-মাতার কর্তব্য হয়ে যায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে তিনটি। প্রথমত, জন্মের পরপরই তার জন্য উত্তম একটি নাম রাখতে হবে, দ্বিতীয়ত, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়লে তাকে কুরআন মাজীদ তথা ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে, তৃতীয়ত, আর সে যখন পূর্ণবয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। (রহীম, ১৯৮৩: ৩৪২)

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ন্যায়বিচার:

ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা ও সন্তানের পর আধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা অগ্রগণ্য তারা হচ্ছে আত্মীয়। পিতা-মাতার ন্যায় আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আত্মীয়দের মধ্যে যারা বড় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো এবং যারা ছোট তাদের অবশ্যই আদর ও স্নেহ করা। আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে এবং নিকট আত্মীয়দের সাথেও উত্তম আচরণ প্রদর্শন করবে। (সু: ৪, আ: ৩৬) তিনি আরও বলেন, ''নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পরস্পরের প্রতি ইহসান ও উপকার করতে ও আত্মীয়স্বজনের অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। (সু: ১৬, আ: ৯০) আত্মীয়দের মধ্যে গরিব-ধনী নির্বিশেষে সকলের সাথে সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব। গরিব ও অভাবগ্রস্ত আত্মীয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্য করাও আমাদের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ''আল্লাহর ভালোবাসা লাভের জন্য নিকট আত্মীয়দের দান কর। (সু: ২, আ: ১৭৭) আত্মীয়রা রোগাক্রান্ত হলে তাদের সেবাযত্ন করা এবং বিপদে-আপদে খোঁজখবর নেয়া আমাদের দায়িত্ব। আত্মীয়দের কোনরূপ কষ্ট দেওয়া যাবে না। আত্মীয়দের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। কোন অন্যায় বা অসৎ কাজে আত্মীয়কে সাহায্য করা যাবে না। আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার:

প্রতিবেশীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। প্রতিবেশীকে বিপদে-আপদে সহযোগিতা করতে হবে। অসুখে-

বিসুখে প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিবেশীর দোষত্রুটি খুঁজে বের করা উচিত নয়, তাদের মঙ্গল কামনা করা, কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া এবং অন্যায়-অত্যাচার না করা আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়ে মহানবী (স.) বলেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে নিরাপদ নয়। (মুসলিম শরীফ, ৪৬) প্রতিবেশীর একজনের হক অন্যজনের কাছে আমানতস্বরূপ। এ আমানতকে অবশ্যই হেফাজত করতে হবে। প্রতিবেশীকে প্রথমে সালাম দেওয়া ও খানাপিনায় শরিক করা প্রতিবেশীর কর্তব্যের শাামিল। তাদের মাঝে উপহার উপঢৌকন বিনিময় করাও প্রতিবেশীর অন্তর্ভূক্ত। নবী মুহাম্মদ (স.) সর্বদা তাঁর প্রতিবেশীদের সাথে চরম দয়া ও বিবেচনার সাথে আচরণ করতেন। রাসুলুল্লাহ(সা.) বলেন, জিবরাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর সাথে সদয় ও নম্র আচরণ করার জন্য সুপারিশ করতে থাকেন, এতটাই আমি ভেবেছিলাম যে তিনি আমাকে তাদের উত্তরাধিকারী করার নির্দেশ দেবেন। (বুখারী, ৬০১৫) প্রতিবেশী যে কেউ কিংবা যেমনই হোক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকলকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারঃ

ইসলাম ধর্ম অনুসারে, সমগ্র পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর একচ্ছত্র মালিকানা একমাত্র বিশ্বস্রষ্ট্রা আল্লাহর। তাঁর এ স্বত্ত্বাধিকারে কারো কোন অংশিদারিত্ব নেই। মূলগতভাবে সম্পদ আল্লাহর। মানুষ হলো আল্লাহর প্রদত্ত সে সম্পদের আমানতদার তথা বিশ্বস্ত ধারক। ইসলাম অর্থনৈতিক সমতা বিধানের জন্য ক্ষমতা এবং অর্থের একটি ন্যায্য নীতি নির্ধারণ করে। ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে সম্পদ উপার্জনে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় এবং সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার দেয়। (Qutb, 1953:69-94) এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিত করা যায় না, তাই মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকাটাই স্বাভাবিক। তদুপরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বৈষম্যের অস্তিত্ব দৈব পরিকল্পনার একটি অংশ, যেখানে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন এবং কারা ভালো এবং কারা মন্দ তা জানার চেষ্টা করেন। ইসলাম শুধুমাত্র যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে সম্পদের পার্থক্যকে অনুমোদন করে। এটা সহ্য করে না যে এই পার্থক্যগুলো এতটা বিস্তৃত হওয়া উচিত যে কিছু লোক জীবনযাপন করে পরম বিলাসিতায় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্র এবং দুর্দশায় জীবনযাপন করে। ইসলাম জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পদ ও সম্পদের ন্যায় ও সুষ্ঠু বন্টনে বিশ্বাস করে। আল্লাহ কুরআনে বলেন,''এতিমদের তাদের সম্পদ দান করো। মন্দের সাথে ভালোর বিনিময় করো না (আপন ব্যবস্থাপনায়) এবং তাদের সম্পদকে নিজের সম্পদে আত্মসাৎ করো না। এটা হবে মহাপাপ। (সুঃ ৪, আঃ ২) ইসলাম দরিদ্রদের অনুকূলে সম্পদের বণ্টন সংশোধন করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে দেয়। ইসলাম একদিকে মানুষের মধ্যে সম্পদের ন্যায্য ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করে এবং অন্যদিকে দরিদ্র ও নি:স্বদের জীবনের মৌলিক চাহিদার আকারে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে।

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। যাকাত অর্থ বিশুদ্ধ হওয়া। বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার একটি উপকরণ হলো যাকাত, যা পণ্যকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। (সুঃ ৯, আঃ ১০৩) মুসলমানদের প্রতি বছর তাদের আয়ের ২.৫ শতাংশ যাকাত হিসেবে প্রদান করার কথা। আল্লাহ বলেন, ''সদ্কা (যাকাত) তা কেবল দরিদ্র, নিঃস্ব, যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারী এবং যাদের মন আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য এবং দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহ পক্ষ থেকে ফরজ বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ।" (সুঃ ৯, আঃ ৬০)

ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতি নির্ধারণ করে এবং ধনীদের সম্পদের প্রতি দরিদ্রদের দাবি প্রতিষ্ঠা করে যার উদাহরণ কুরআনে দেওয়া হয়েছে। সম্পত্তির ইসলামিক নীতি অনুযায়ী, একজন ধনী ব্যক্তির সম্পদে অভাবী লোকদের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "এবং যার সম্পদে স্বীকৃত হক রয়েছে (ভিখারী এবং অসহায়দের জন্য)। (সু: ৭০, আ: ২৪-২৫) কুরআন সম্পদকে 'তোমাদের ধনীদের মধ্যে একটি চক্র তৈরীর করার' অনুমোদন করে না। (সু: ৫৯, আ: ৭) তাই বিশ্বাসীদেরকে বিভিন্ন আকারে দাতব্য ব্যয় করতে উৎসাহিত করে। কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেন, ''এবং নিয়মিত নামায কায়েম কর এবং নিয়মিত যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। (সু: ৭৩, আ: ২০) এইভাবে ইসলাম দূর্বলকে শক্তিশালীদের দ্বারা অর্থনৈতিক শোষণ থেকে রক্ষা করে। ইসলামী নীতিশাস্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের গুরুত্ব কম, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্বের চেয়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো এই বিশ্বাস করা ও মনেপ্রানে ধারণ করা যে, সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের হাতে উপার্জিত সব সম্পদ মূলত আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত। তাই আল্লাহর আমানতের প্রতি ইসলাম ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে বলেছে।

ব্যবসা ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারঃ

ইসলাম একটি শ্বাশত, সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই সৃষ্টিজগতের সবক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের নির্দিষ্ট নীতিমালা। আয়-উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইসলাম হালাল পথে উপার্জন ও সঠিক পথে ব্যয়ের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ব্যপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো:'' আল্লাহ ব্যবসাকে (ক্রয়-বিক্রয়) হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই '' কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে অনন্তর সে বিরত রয়েছে, তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহ্র ওপর ন্যস্ত। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারাই জাহান্নামী হবে; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।'' (সু: ২, আ: ২৭৫) ইসলাম অন্যায় ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনকে বিরোধিতা করে। সমাজের একশ্রেণীর মানুষ সুদী কারবারীর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। সুদ একটি মারাত্বক অপরাধ। ব্যবসার নামে সুদ চালু করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহর ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।'' (সু: ৩, আ: ১৩০) ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসা ও আয়-ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়া, খারাপ বস্তুকে ভালো বলে বিক্রি করা, দ্রব্যে ভেজাল দেয়া প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এই নির্দেশনা অমান্যকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক পাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ।" (সু: ১৭, আ: ৩৫) উপার্জিত অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো এরূপ যে, "এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সু: ১৭, আ: ২৬-২৭) মানুষকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করতে ও অপচয় করতে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। ইসলামে রয়েছে নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র, যেখানে সুদ, জুয়া, অন্যায়, অনিয়ম ও বৈষম্যের কোন স্থান নেই। তাই সামাজিক পর্যায়ে কোন বৈষম্য থাকবে না। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ আয়-ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রেও ইসলাম নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহবান জানায়।

পেশাগত ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারঃ

জীবনের জন্য জীবিকার্জন একটি ইবাদততুল্য কর্তব্য। চাকুরি একজন সুনাগরিকের উপার্জনের মাধ্যম, পেশাগত পরিচয়। আল্লাহ সবার রিজিকদাতা। তিনি মানুষের জন্য ব্যবস্থা করেছেন 'রিজিকান কারিমা' (সম্মানজনক জীবিকা) এবং এর অর্জন কৌশল হতে হবে 'হালালান তাইয়্যেবা' (বৈধ ও পবিত্র)। ইসলামের দৃষ্টিতে চাকুরি নির্বাচনের আছে বৈধ-অবৈধতার সীমারেখা। মহান আল্লাহর আদেশ ও প্রিয় নবী (সা:) এর আদর্শ বিবর্জিত উপায়ে সব চাকুরি ও চাকুরির আয়-রোজগার হারাম। যেমন-সুদ ও মাদক ইত্যাদি। পেশাগত ক্ষেত্রে ইসলামের মূল আদর্শ হলো প্রত্যেক চাকুরে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পুর্ণনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার সাথে পালন করবে। নিয়োগদাতা কর্তৃপক্ষের আরোপিত শর্ত মেনে চলবে। চাকুরীজীবী কর্তৃপক্ষের অনুগত, বৈধ আদেশ পালন করা, কর্তব্যে অবহেলা পরিহার, কর্তৃপক্ষের সম্পদ স্বার্থ রক্ষা করা, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার পরিহার করবে। অঙ্গীকারে আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! 'তোমরা অঙ্গীকার গুলো পূরণ করো।'[৫৫] সু: ৫, আ: ১) এক্ষেত্রে অবশ্যই সকলকে যাবতীয় অনিয়ম, দুর্নীতি যেমন ঘুষ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি, অন্যায়ভাবে কাউকে সুযোগ সুবিধা দান, কারো প্রতি জুলুম করা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা ইসলামে এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি-পরায়ণদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা রয়েছে।

শ্রমিক-মালিকের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারঃ

জীবনধারণের জন্য সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষকে একে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এক ব্যক্তির অধীনে একাধিক ব্যক্তি কাজকর্ম করে। তাই প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য পাওনা ও সম্মান বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম অধীনস্ত লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ''তোমার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে ভালো আচরণ কর এবং নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিনস্থ যেসব দাস-দাসী (শ্রমিক) রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও।" (সু: ৪, আ: ৩৬) মনিবের উচিত তার শ্রমিকের শক্তি ও সামর্থ্য বিচার করে তাকে কাজ দেওয়া। শ্রমিককে তার সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ দেওয়া যাবে না। অধিনস্ত লোকের কাজে ভুল-ভ্রান্তি হলে তাকে দৈনিক সত্তর বার ক্ষমা করার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ করে সকল কাজে মালিক শ্রমিকের মাঝে কোন বৈষম্য ইসলাম অনুমোদন করে না। শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে মহানবি বলেছেন, "তারা (যারা তোমাদের কাজ করে) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধিনস্ত করে দিয়েছেন। সে (মালিক) যা খায় তার অধিনস্তদেরও যেন তা খাওয়ায়। সে(মালিক) যা পরে তাদেরকে যেন তা পরতে দেয়। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না যা তার ক্ষমতার বাইরে। এমন কাজ (ক্ষমতার বাইরের) হলে তাকে (শ্রমিককে) যেন সাহায্য করে।" (বুখারী, ৫৬১৭) শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। মহানবি বলেছেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" (ইবনে মাজাহ, ২৯৮৭) এইভাবে শ্রমিক ও মালিকে দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দিষ্ট করে ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মানুষকে উৎসাহিত করেছে।

নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারঃ

আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি মানবজাতিকে, একটি একক দম্পতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ''হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। আল্লাহ দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক। আল্লাহ

প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ ।"(সু: ৪৯, আ: ১৩) কুরআনের এই আয়াত অনুসারে মানুষের মধ্যে ধর্ম ও বর্ণের পার্থক্য দেখা যায়। উদ্দেশ্য বৈষম্য নয়, কিন্তু সনাক্তকরণ । মূল কথা হলো প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষ সমান। চরিত্রের দিক থেকে একজন মানুষকে অন্যের থেকে আলাদা করে তুলেছে। তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা যেতে পারে কেবলমাত্র একজন মানুষ যে মাত্রায় সম্মানিত। সত্যিকারের সম্মানিত ব্যক্তি হল সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহকে ভয় করে। এবং যিনি স্বীকৃতি দেন যে, আল্লাহ তার সমস্ত আধিকার পূরণ করে। ইসলামে নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ''হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক জীবন্ত সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এই উভয় থেকেই অসংখ্য পুরুষ ও নারী (সৃষ্টি করে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।"(সু: ৪, আ: ১) এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মধ্যে যেমন রয়েছে পুরুষ তেমনি নারী। পুরুষ ও নারী একই উৎস থেকে প্রবাহিত মানবতার দুটো স্রোতধারা। নারী ও পুরুষ একই জীবন সত্তা থেকে সৃষ্ট, একই বংশ থেকে নিঃসৃত। দুনিয়ার এই বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ একই সত্তা থেকে উদ্ভূত। আর নারী পুরুষেরই অপর অংশ এবং এ দুয়ে মিলে মানবতার এক অভিন্ন অবিভাজ্য সত্তা। নারী ও পুরুষ যে সব দিক দিয়ে সমান, প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের জন্য একান্তই অপরিহার্য কেউ কাউকে ছাড়া নয়, হতে পারে না, স্পষ্টভাবে নিচের আয়াত থেকে বোঝা যায়। " নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা একে অপরের অংশ।" (সু: ৩, আ: ১৯৫) এখানে 'তোমরা একে অপরের অংশ মানেই হচ্ছে এই যে, এরা সবাই একই আসল ও মূল থেকে উদ্ভূত এবং তারা পরস্পরের সাথে এমনভাবে জড়িত ও মিলিত যে, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। দ্বীনের দৃষ্টিতে তারা সমান, সেই অনুযায়ী আমল করার দায়িত্বও দুজনার সমান এবং সমানভাবেই সে আমলের সওয়াব পাওয়ার অধিকারী তারা। এক কথায় নারী যেমন পুরুষ থেকে তেমনি পুরুষ নারী থেকে কিংবা নারী পুরুষ উভয়ই অপর নারী-পুরুষ থেকে প্রসূত। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, '' মেয়েলোকেরা যে পুরুষদেরই অর্ধাংশ কিংবা সহোদর এতে কোন সন্দেহ নেই ।" (রহীম, ১৯৮৩: ৫৭) বস্তুত, নারী ও পুরুষ যেন একটি বৃক্ষমূল থেকে উদ্ভূত দুটি শাখা। এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের দুটো শাখার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করেছেন।

অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারঃ

মানব মনের অপরাধপ্রবণতা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। এই অপরাধপ্রবণ মনকে অপরাধমুক্ত করে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচার। অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসনের প্রতি কুরআনে বার বার জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে ন্যায় ও আইনের পথ ব্যতীত জীবন (প্রাণ), প্রকাশ্য বা গোপনে গ্রহণ (হত্যা) না করার আদেশ দেন। (সু: ৬,আ: ১৫১)

কিন্তু তারপরেও যদি কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে তবে হত্যা প্রমাণ হওয়ার পর হত্যাকারীর বিষয়টি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ইখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে বিচার বিভাগের মাধ্যমে কিসাস হিসেবে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে পারে কিংবা দিয়াত-রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে কিংবা ক্ষমা করে দিতে পারে। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, ''প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং বিশেষ যখমের বদলে অনুরূপ যখম কিন্তু যে তা ক্ষমা করবে, তবে সে গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যাবে।" (সু: ৫,আ: ৪৫) কুরআনের এ আয়াত থেকে বোঝা যায় অত্যাচারিত মানুষ অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার রাখে। তবে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে "যদি তোমরা শাস্তির প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতখানি কষ্ট তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তবে

তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য তা খুবই উত্তম ব্যাপার। (সু: ১৬, আ: ১২৬) এই ক্ষেত্রে এটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। এই সীমার পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিশোধের সমতা অবশ্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ আসলে আত্মসংযম এবং ক্ষমাকে উৎসাহিত করেছেন। যে কোন ক্ষেত্রে, সমবেদনা শত্রুতার চেয়ে উত্তম। প্রতিশোধের ক্ষেত্রে, সমতা হলো সীমা, আঘাত, আঘাত প্রাপ্ত ব্যাক্তি অবশ্যই প্রাপ্তআঘাতকে অতিক্রম করবে না। অত্যাচারিত মানুষ অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে বা অন্যায়কারীদের ক্ষমা করার জন্য সমান পদক্ষেপ নিতে পারে। তবে আবেগের বশবর্তী হয়ে তাড়াহুড়ো করে কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। কেননা একজন আবেগপ্রবণ ব্যক্তি যুক্তি বা আইনি সীমা দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। আর তাই আবেগ থেকে ঘৃণার তৈরি হয়। ঘৃণার বশবর্তী হয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে সে শেষ পর্যন্ত অন্য অপরাধ করতে পারে। তাই অন্যায়কারীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য সময় নেওয়া প্রয়োজন যতক্ষণ না রাগ কমে যায় । এমনকি অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা যায়, যদি বস্তুনিষ্ঠতা হারানোর সম্ভাবনা থাকে তবে তাড়াহুড়ো করে অন্যায়কারীর প্রতি অবিচার করার চেয়ে ভালো হবে। বিশ্বাসীদের এ ধরণের কাজে জড়িত হওয়া থেকে বিরত করার জন্য আল্লাহ তাদের এই পাপ বা ধৃণাভিত্তিক প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের জন্য কঠোর ঐশ্বরিক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। অনেকের মনে হতে পারে অন্যায়কারীর সাথে এমন পাল্টা আচরণ করা সঠিক কাজ হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি অন্যায়কারী বিরুদ্ধে আবেগ ও শত্রুতার ফলে ন্যায় বিচার থেকে বিচ্যুত হয় তবে সৎ কাজগুলো সহজেই হারিয়ে যেতে পারে। এমনকি ন্যায়বিচারের বস্তুনিষ্ঠতা বলে কিছু থাকবে না। ন্যায়বিচারের সর্বজনীনতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার গুরুত্ব ন্যায়বিচারের সমর্থকদের কাছে আল্লাহর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিতে প্রতিফলিত হয়।

পর্যালোচনা:

সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাটি মূলত স্বাধীনতা, সাম্য এবং সংহতির ধারণা। সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলো কুরআনে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে যাতে রয়েছে -মানুষের সম্মানজনক মর্যাদা, সাম্য, মানুষের স্বাধীনতা, সংহতি, সম্পদ ও সুযোগের সুষ্ঠু বন্টন এবং মানবাধিকারকে সম্মান করা। কুরআনে সর্বপ্রথম মানুষের বিভিন্ন অধিকার সংরক্ষণের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনে, দারিদ্রের কারণে শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আইনগত অধিকার ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করা যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি। এই বিশ্বাস থেকে একজন মুসলিম অনুপ্রেরণা ও শক্তি অর্জন করে, যার ফলে সে নিজেকে অন্য সকল মানুষের সমান মনে করে। ইসলামে ন্যায়বিচার মানুষের সমতার সথে জড়িত। ইসলাম সংকীর্ণ ও বস্তুগত অর্থে সমতাকে কল্পনা করে না। এই সাম্য মুসলমানদের আত্মাকে পরিবেষ্টন করে। কারণ ইসলাম মানুষের আত্মাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আত্মার নৈতিক মান উন্নীত করার নির্দেশনা দেয়। আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন "আপনি মুমিনদেরকে তাদের নিজেদের মধ্যে করুণা, পরস্পর ভালোবাসা প্রদর্শন করতে দেখেন নিজেদের মধ্যে সদয় হওয়া, একটি দেহের মতো হওয়া, যাতে শরীরের কোন অঙ্গ ভালো না থাকলে সারা শরীর তার সাথে নিদ্রাহীনতা (অনিদ্রা) এবং জ্বর ভাগ করে নেয়।" (বুখারী, ৬০১১) সৃষ্টিতে মানবজাতির সমতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, "সকল মানুষ ছিল একই (জাতি)।" (সু: ১০, আ: ১৯) ইসলাম সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের ওপর জোর দেয় যাতে মানুষ একটি সম্পূর্ণ এবং কার্যকর জীবনযাপন করতে পারে। একটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ ইসলামের মৌলিক নিয়ম অনুসরণ করে, ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে ও সকল মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে আল্লাহ সমর্থন পেতে পারে এবং একইভাবে আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা পেতে পারে। এই সহযোগিতা সামাজিক স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে। আত্মীয়তা বা সামাজিক সংহতির অনুভূতি তৈরি করে। সংহতির

বিভিন্ন স্তরে পরিবার, গোষ্ঠী বা জাতি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সমাজকে একত্রে আবদ্ধ করে এবং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

আল্লাহ উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানবজাতিকে বিভিন্নরূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা একে অপরকে জানতে পারি, এবং আল্লাহ মহিমা ঘোষণা করতে পারি। যখন মানবজাতি বুঝতে পারবে যে আমরা আসলেই এক উম্মত তখন কোন বৈষম্য থাকবে না। আজকের দিনে মানবতা এক ব্যাপক নৈতিক সংকটে নিপতিত। তাই আমরা যদি নৈতিক ও মানবিক সমতার নীতিকে মেনে নেই, তাহলে আমাদের সমস্ত বর্ণবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং জাতিকেন্দ্রিকতা প্রত্যাখান করতে পারি। আর এটাই আমাদের ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র প্রতিকার এবং শান্তি।

মানুষ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ্ দিতে পারে মানুষের জীবনের নানা সমস্যার সমাধান। মহানবী (সা.) এ ব্যাপারে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।" (ইবনে মাজাহ, ৩০৭৪) ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মানুষের মনন, কর্ম ও ব্যবহারিক জীবন প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে সর্বজনীন ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ জাগ্রত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে এবং পরিবারে নৈতিক শিক্ষাকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। সমাজ থেকে অসমতা দূরীকরণে ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যাতে করে একটি সর্বোত্তম ন্যায়ভিত্তিক সামাজিকজীবন নিশ্চিত করা যায়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরাই হলো সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে।" (সু: ৩, আ: ১১০) ব্যক্তি ও সমাজ ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি জাতির উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের চর্চা গুরুত্বপূর্ণ। একটি পূর্ণঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানুষের সমাজজীবনে ন্যায়বিচারের যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে তা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নির্দেশনা বলা যায়। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচারের ইসলামী নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের জোর তাগিদ দেয়।

উপসংহার:

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে গঠন ও পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানে যুগে যুগে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ন্যায়বিচার সম্পর্কিত নির্দেশনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম শব্দটির আক্ষরিক অর্থ আল্লাহর ইচ্ছা ও আইনের কাছে আত্মসমর্পণ যে আত্মসমর্পণ শান্তির বাহক। ইসলাম তার বিশ্বাসীদের বাধ্যবাধকতা পূরণে নির্দেশ দেয়। এই বাধ্যবাধকতাগুলো মানব সম্পর্কের ভিত্তি এবং সমস্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য কর্তব্যগুলি তুলে ধরে। এই পার্থিব জগতের কার্যাবলীর ওপর পরকালীন জীবনের সফলতা নির্ভর করছে। মানুষ এই পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করে। তাই সকল ধর্মই পার্থিব জগতের সকল প্রকার অন্যায় ও অসৎ কাজকে নিরুৎসাহিত করেছে। সকল ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ থাকলেও নীতি-নৈতিকতার ব্যাপারে বেশকিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা যদি তাদের ধর্মের মৌলিক কিছু নৈতিক শিক্ষাকে গভীরভাবে অনুশীলন করে, (যা অন্য ধর্মেও আবশ্যিক করা হয়েছে) তাহলে তা সমাজে সংহতি আনায়নে

সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। ইসলামে ন্যায়বিচার একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সামাজিকজীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই জীবনাচরণ মুসলিমদের জন্য প্রকারান্তে পালনীয় আদর্শ হিসেবে ইসলাম নির্দেশনা দেয়।

মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করতে হলে ন্যায়-নীতির অনুসরণ ও অনুশীলন অপরিহার্য। ন্যায়-নীতি ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। পরকালে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করলে ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠন করা সম্ভব। আলোচ্য প্রবন্ধে সমাজিকজীবনের প্রতিটি ক্ষত্রে ন্যায়বিচারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং এটাই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা মানুষকে ন্যায়ানুগ করে। দার্শনিক সক্রেটিস ও প্লেটো তাঁর দার্শনিক আলোচনায় জ্ঞানের ধারণার সাথে ন্যায়বিচারের ধারণা এবং সামগ্রিকভাবে সত্যের ধারণার সম্পর্ক তৈরি করেছেন। এই হিসেবে জ্ঞান হিসেবে জ্ঞান, সঠিক স্থান, ন্যায়বিচার যথাস্থানে থাকার শর্ত এবং সত্য যথাস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্লেটো মনে করেন, আত্মার যথার্থ ধর্মই হচ্ছে ন্যায়, ন্যায় কাজ করা। তিনি মনে করেন, আমরা প্রত্যেকে যদি যার যার অবস্থান থেকে তার তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করি তাহলে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিকজীবন তথা রাষ্ট্রীয়জীবনে ন্যায়বিচার সম্ভব। এভাবে ব্যক্তিপর্যায় থেকে শুরু করে সামাজিকজীবনে প্রত্যেক মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে। ইসলাম তার বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে উপাসনাকে নির্দেশ করে না, বরং এটি জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে নিজের মধ্যে উপলব্ধিকারী উপসনা হিসেবে গণ্য করে যতক্ষণ তারা সুচেতনা, কল্যাণ ও সততার সীমার মধ্যে থাকে। (Qutb, 1953:8-9) এখানে জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ন্যায়ের ভিত্তিতে করার কথা বলা হয়েছে। কোন কাজ যদি ন্যায়ের সাথে করা হয় তবে তা ইবাদত বলে গন্য হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, তোমরা ন্যায়বিচার করো, কারণ ন্যায়বিচার পরহেজগারীর অতি নিকটবর্তী।' (সু: ৫, আ: ৮) তাই কুরআনের ন্যায়বিচারের বাধ্যবাধকতাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করা দরকার। আল্লাহর একজন বান্দা হিসেবে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। কেননা ইসলাম তার বিশ্বাসীদেরকে জীবনের সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট ন্যায়পরায়ণ হতে আদেশ করে। (সু: ৮৩, আ: ১-৩) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর আদেশ এই পৃথিবী ও পরকালীন শান্তির জন্য আল্লাহ কর্তৃক আদেশিত উচ্চ নৈতিক নির্দেশনারই প্রকাশ।

তথ্য নির্দেশ:

রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর (রহ), (১৯৮৩), *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

Ali, Abdullah Yusuf [Translated, 2000], *The Meaning of the Holy Qur'an,* New Delhi: Islamic Book Service.

Ayoub.Mahmoud. (1996) "*Islamic Concept of Justice*" Islamic Identity and the Struggle for Justice. Ed, Nimat Hafez Barazangi (et.al). Gainesville: University Press of Florida.

Campanini, Massimo. (2006) "Adl". *The Quran: An Encyclopaedia*. Ed. Oliver Leaman. New York: Routledge.

Ibn Majah, (2009), *Sunan Ibn Majah*. Syria: Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah.

Ismail, Khalid Bin, *Islam and the Concept of Justice, Web address:https://ir.uitm.edu.my*>...Accessed on:15.1.2024, Time:10:10 P.M(Bangladesh).

Junaidi, Juliyana 1, Majid, Latifah Abdul 2, Nazri, Mohd Arif 3, (2022), *SOCIAL JUSTICE PRACTISE IN THE PROPHETIC TRADITION: AN OVERVIEW OF SELECTED CONTEMPORARY ISSUES*, Journal of Positive School Psychology, Vol.6, No.4, 2409-2421, http://journalppw.com,

Kounsar, Asma (2020), *Prophet, Muhammad (PBUH.) and Social Justice: Some Reflections*, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR).

Khan, Dr. Muhammad Muhsin [Translated, 1996], Sahih *Al-Bukhari*, Riyadh: Dar-Us-Salam Publications.

Khadduri, Majid. (1984), *The Islamic Conception of Justice*. USA: John Hopkins University Press.

Manan, A. (2005), *Social justice Under Islam*, Reference press, New Delhi.

Qutb, Sayyid. (1953), *Social Justice in Islam*, Eng. tr. John B. Hardie. Washington D.C. American Council of Learned Societies.

Siddiqui, Abdul Hamid [Translated, web: http://www.peacevision.com/] *Sahih Muslim*.

Sharif, M. M. (1961), *A Histry Of Muslim Philosophy,* Complete and Unabridged, AVenture Of Low Price Publications.

[**Abstract :** The concept of justice can be related to law, politics, religion, economics, and many other social aspects. Among all the sectors, Social Justice bears the widest area, because any type of justice-related discussion or decision finally makes its impact on society. There are various philosophical theories regarding social justice. On the other hand, most of the religions have given their directions on this issue. Islam gives immense importance to social justice. This article aims to discuss and evaluate the Islamic view of justice regarding different social sectors. I have shown that the Islamic viewpoint of achieving and maintaining justice in several social sectors is strongly competent and suitable for application in different wings of society. The method of this research is mainly analytic and evaluative.]